বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা

ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী

'বিদ্যাসাগর' -কে তোমরা হয়তো কেউ জানো,কেউ জানো না। আজ থেকে প্রায় একশ বিশ বছর আগে তিনি ইহজগত্ ছেড়ে চলে গেছেন। আজকের পাঠ্যপুস্তক বা সাহিত্য-আলোচনায় তেমন করে বিদ্যাসাগরকে পাওয়া যায় না।'বিদ্যাসাগর' তাঁর নাম নয়-এটি তাঁর উপাধি। যথার্থই তিনি বিদ্যারসাগর এবং করুণার সিন্ধুও বটে। মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। এ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্প বেতনের চাকরি করতেন কলকাতায়। এই পরিবারে ছিল না শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ। অন্দরে মেয়েলি কলহ,অগ্রজে-অনুজে অবজ্ঞা, অভাব-অনটন–এরই মধ্যে জন্ম নিলেন একটি 'এঁড়ে বাছুর'(পিতামহের পরিহাস সূচক সম্বোধন)। পিতামহের পরিহাস মিথ্যে হয় নি, সত্যিই তিনি এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে স্বভাবের ছিলেন। এই জেদী মনোভাব তাঁকে একসময় স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং সিদ্ধান্তে অটল করেছে।

শিশু ঈশ্বর বাবাকে মোটেও ভয় পেতেন না,বরং বাবা যা বলতেন,ঠিক তার উল্টোটি করতেন। বাবা যদি বলতেন-ঈশ্বর স্নান করো,সাথে সাথে ঈশ্বর 'স্নান করবো না'বলে গোঁ ধরতেন। তাই বাবা এক নতুন ফন্দি আঁ্টলেন। বাবা বললেন-ঈশ্বর আজ পড়া নয়,শুধু খেলা। অমনি ছেলে খেলা ছেড়ে বসে গেল পড়তে। শুধু কী তাই। গ্রামের নামকরা ডানপিটে ঈশ্বর পাঠশালা যাবার পথে লোকের ধানক্ষেত-যবক্ষেত ইচ্ছে মতো মাড়িয়ে দিতেন। ধানের ছড়া ছিঁড়তেন, ছড়াতেন। তাঁর দস্যিপনার সহচর ছিল গ্রামের কিছু সমবয়সী ছেলের দল। দুরন্ত আর অবাধ্য বালক ঈশ্বর গুরুমশায়ের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন,কারণ ঈশ্বর আর যাই করুক পাঠে খুব মনোযোগী ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। ছয় বছরের পাঠ মাত্র তিন বছরেই শেষ করে ফেললেন। গুরুমশায় তাঁর পিতাকে ডেকে বললেন,ওকে কলকাতায় পড়ালে ভলো হতো,ওর যা মেধা তাতে নিশ্চয় ও একজন মস্ত বড় বিদ্বান হবে। কলকাতায় ভর্তি হওয়াই ঠিক হলো। সেসময় ভাল লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় না যেয়ে উপায় ছিল না। শুভদিনে যাত্রার দিন ধার্য হলো। পিতা-পুত্রের সাথে চললেন গুরুমশায় এবং একজন চাকর । মেদেনীপুর থেকে কলকাতা প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। যানবাহন বলতে কেবল নৌকা। নৌকায় নানান বিপদের সম্ভাবনা। তাই হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অতি উৎসাহে হাঁটতে থাকেন আট/নয় বছরের ঈশ্বর। পথে যেতে যেতে হাজারো প্রশ্ন তাঁর। ছেলের কৌতহল আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে বাবা ভুলে গেলেন অভাবের কথা।

কলকাতায় একজনের বাড়িতে বাবার সাথে থাকতেন ঈশ্বর এবং ছোট এক ভাই। নিয়মিত দু'বেলা আহারের সংস্থান করা বেশ কষ্টকর ছিল পিতা ঠাকুরদাসের। এছাড়া টুকিটাকি অনেক কাজ যেমন রান্না করা,বাটনা বাটা,বাসন মাজা এসব করতে হতো কিশোর ঈশ্বরকে। অভাব-অনটন-ক্ষুধা নষ্ট করতে পারে নি ঈশ্বরের লেখাপড়ার অদম্য ইচ্ছাকে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ঈশ্বরের লক্ষ্য ছিল ভালো ফল করতেই হবে। করেছেনও তাই। ভালো ফলাফলের জন্য বৃত্তিও পেয়েছেন। ব্যাকরণ,কাব্য,অলঙ্কার, বেদান্ত,স্মৃতি,ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন –'ক্ষতির আশঙ্কা উপেক্ষা করে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বারংবার আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন।'তিনি এও বলেছেন যে,বিদ্যাসাগর অকৃত্রিম মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন।বিধিদত্ত সম্মান পূর্ণভাবে নিজের অন্তরে লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।সংস্কৃতে পণ্ডিত হয়েও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, চেতনা ছিল সংস্কারমুক্ত। বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' বলেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

☼ **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** [Iswarchandra Vidyasagar]:- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হলেন উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের প্রাতঃস্মরনীয় মহাপুরুষ । তিনি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী । কলকাতার সংস্কৃত কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন । ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পান্ডিত্য লাভ করে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এবং পরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি এই কলেজের আমূল সংস্কার ও পুনর্গঠন করেছিলেন । মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বই লেখার কাজে ব্রতী হন । বাংলা গদ্য তখনও গড়ে ওঠেনি । কেবল রাজা রামমোহন রায় আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত কিছুটা এই বিষয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন । এঁদের রচনা ছিল বেশ আড়ষ্ট ও জটিল । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্যকে সরস ও মধুর করে সাধারণের হৃদয়বেদ্য করে তুলেছিলেন । এজন্য তিনি 'বাংলা গদ্যের জনক' নামে খ্যাত । সে যুগে বাঙালি ছাত্রদের উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক ছিল না । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের জন্য প্রথম বর্ণপরিচয়, কথামালা, ঋজুপাঠ, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক লেখেন । অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

♦ **শিক্ষা বিস্তার** [Educational Reforms]:- শিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান-

(ক) শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কারণ তিনি বুঝেছিলেন, নারী জাতি অনগ্রসর ও কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়ে থাকলে সমাজ পিছিয়ে থাকবে ।

(খ) স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহযোগিতা পান । বিদ্যালয় পরিদর্শকের সরকারি পদে থাকার সুবাদে তিনি ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ১০০ টি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন । এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় '**হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়** ' (বর্তমান **বেথুন** স্কুল) স্থাপন করা । সংস্কৃত-শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজে অ-ব্রাহ্মণ শ্রেণির ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা করেন ।

(গ) ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রাম বীরসিংহে একটি অবৈতনিক **'ইঙ্গ সংস্কৃত বিদ্যালয়'** স্থাপন করেন । উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি **'মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন'** প্রতিষ্ঠা করেন ।

(গ) গণশিক্ষার প্রসারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতৃভাষায় পঠন পাঠনের গুরুত্ব অনুভব করেন । এই জন্য তিনি সহজ-সরল পাঠ্যপুস্তক রচনায় আগ্রহী হন । শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বর্ণপরিচয়, কথামালা, ঋজুপাঠ, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক লেখেন । অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

♦**সমাজ সংস্কার** [Social Reforms]:- সমাজ-সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান:-

বাংলার সংস্কার আন্দোলন, বিশেষত নারীকল্যাণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান চিরস্বীকার্য । উনিশ শতকের নবজাগরণ ছিল তাঁর সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের সার্থক পরিণতি ।

(১) পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপ বাংলা তথা ভারতের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে । বাল্য বিবাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয় । তাঁর প্রচেষ্টায় গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এক আইন প্রণয়ন করে বিধবা বিবাহকে আইন সিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন । এছাড়া প্রধানত বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৬০ খ্রিটাব্দে সরকারি আইন প্রণয়ন করে কন্যার বিবাহের বয়স সর্বনিম্ন দশ বছর নির্ধারিত করা হয় ।

(২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে ধর্মকে সংযুক্ত না করে মানবতাবাদের ওপর ভিত্তি করে একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন । বিদ্যাসাগর ছিলেন একক সংগ্রামী— তিনি কোনো গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে প্রয়াসী হননি । রাজা রামমোহনের মতো ব্রাহ্মসমাজ অথবা ডিরোজিও -র নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তোলেননি ।

♦ **ভারতীয় নারীদের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান** [Contribution of Iswarchandra Vidyasagar for Walefare of Indian women]:-উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ । তাঁর পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চেতনার প্রতিফলন পড়েছিল । প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির অপসারণ করে তিনি সামাজ জীবনকে কলুষমুক্ত করতে চেয়ে ছিলেন । উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারের প্রধান দিকটি ছিল নারী জাতির কল্যাণসাধন ।

(১) উনবিংশ শতকের এক বিরাট পণ্ডিত ও মহান সমাজ-সংস্কারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । সারাজীবন ধরে তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী থাকেন । বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, নারী জাতি অনগ্রসর ও কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়ে থাকলে সমাজ পিছিয়ে থাকবে । বিদ্যাসাগর নারীমুক্তি আন্দোলনের (১৮২০ - ৯১ খ্রি:) প্রবল সমর্থক ছিলেন ।

(২) হিন্দুশাস্ত্র উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে জোর বক্তব্য রাখেন ।

(৩) বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল জনমত গড়ে তোলেন । শেষ পর্যন্ত তাঁর আন্দোলন সফল হয় এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ হয় ।

(৪) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে জোর প্রচার শুরু করেন এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদন পত্র সরকারের কাছে পেস করেন । প্রধানত বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৬০ খ্রিটাব্দে সরকারি আইন প্রণয়ন করে কন্যার বিবাহের বয়স সর্বনিম্ন দশ বছর নির্ধারিত করা হয় ।

(৫) নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারেও তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না । বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে থাকার সুযোগে তিনি ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় '**হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়** ' (বর্তমান **বেথুন** স্কুল) স্থাপন করা ।

***